بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুমআ

"ইসলামে শাস্তির ধারণা বা বিধান অবশ্যই আছে কিন্তু সাথে ক্ষমা বা মার্জনা এবং উপেক্ষারও নির্দেশ বর্তমান। অপকর্মকারী ও পাপাচারীকে শাস্তি দাও কিন্তু সেই শাস্তির পশ্চাতেও এই উদ্দেশ্য থাকা চাই যে, এই শাস্তির ফলশ্রুতিতে পাপাচারী ও ক্ষতিকারকের এবং অত্যাচারীর সংশোধন হবে। সুতরাং যেখানে সংশোধন উদ্দেশ্য হয় সেখানে শাস্তি প্রদাণের পূর্বে এটি চিন্তা করো, যে এই শাস্তি দ্বারা কি লক্ষ্য অর্জিত হওয়া সম্ভবপর কিনা।"

সৈয়দনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন হতে প্রদত্ত ২২শে জানুয়ারী, ২০১৬-এর জুমআর খুতবার কিয়দংশ

তাশাহুদ, তাউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) নিম্নলিখিত আয়াতের তেলাওয়াত করেন-

وَجَزٰٓؤُا سَیِّئَۃٍ سَیِّئَۃٌ مِّثۡلُہَا ۚ فَمَنۡ عَفَا وَاَصۡلَحَ فَاَجۡرُہٗ عَلَی اللّٰہِ ؕ اِنَّہٗ لَا یُحِبُّ الظّٰلِمِیۡنَ (الشوریٰ:۴۰) অর্থাৎ 'এবং অপকর্মের প্রতিফল উহার অনুরূপ শাস্তি, অতএব যে ব্যক্তি ক্ষমা করে এবং সংশোধন করে তার পুরস্কার আল্লাহর হাতে বা আল্লাহর জিম্মায়। আল্লাহ্ অন্যায়কারীদের আদৌ ভালবাসেন না।

ইসলামী শিক্ষায় কোন মন্দ কর্মসম্পাদনকারী, ক্ষতিসাধনকারী সে ক্ষতি স্বল্প পরিসরে হোক বা বিশাল ক্ষতিসাধন হোক বা বৃহৎ আকারে ক্ষতিসাধন হোক অথবা শত্রুই হোক না কেন প্রত্যেকের সহিত সেই আচরণ করার শিক্ষা দেওয়া আছে যা সংশোধন সংক্রান্ত উদ্দেশ্যাবলীর সহিত করা হয়। ইসলামে শাস্তির ধারণা বা বিধান অবশ্যই আছে কিন্তু সাথে ক্ষমা এবং উপেক্ষারও নির্দেশ বর্তমান। এই আয়াতে যেমনটি আপনারা শুনলেন এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে যে অপকর্ম ও পাপাচারীকে শাস্তি দাও কিন্তু সেই শাস্তির পশ্চাতেও এই উদ্দেশ্য থাকা চাই যে এই শাস্তির ফলশ্রুতিতে পাপাচারী ও ক্ষতিসাধনকারী এবং অত্যাচারীর সংশোধন হবে। সুতরাং যেখানে সংশোধন উদ্দেশ্য হয় সেখানে শাস্তি প্রদানের পূর্বে এটি চিন্তা করো, যে এই শাস্তি দ্বারা কি লক্ষ্য অর্জিত হওয়া সম্ভবপর কি না। যদি চিন্তা করার পরও, অপরাধীর অবস্থা দেখার পরও এদিকে মনোযোগ ফিরে আসে যে এই অপরাধীর সংশোধন তো ক্ষমাপ্রদানের পর হওয়া সম্ভব তবে ক্ষমা করা উচিৎ অথবা শাস্তি প্রদানে হওয়া সম্ভব হলে তবে শাস্তি দাও। আর এই ক্ষমা প্রদানও তোমাকে আল্লাহতাআলার পক্ষ হতে আল্লাহতাআলা বলেন যে, সর্বত্তম পুরস্কারের অংশীদার বানাবেন। আয়াতের শেষের দিকে انه لا يحب الظالمين বলে এও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, শাস্তি প্রদানে যদি সীমাতিক্রম করার চেষ্টা করবে তবে অত্যাচারী উৎপীড়ণকারীদের অন্তর্ভূক্ত হবে। যাইহোক এই মৌলিক আইন এবং নীতি শাস্তি ও সংশোধনের বিষয় কোরআন শরীফে উপস্থাপিত হয়েছে যা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যাগুলির উপরও প্রভাবশীল হয়ে আছে এবং সরকারী সমস্যাবলীতেও বরং আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলিতে সামাজিক সংশোধনের ক্ষেত্রেও এটি মূল ভিত্তি। কোন অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের প্রকৃত উদ্দেশ্য যেভাবে আমি বলেছি সংশোধন ও নৈতিক উন্নতিসাধন হওয়া আবশ্যকীয়।

অতএব ইসলাম বলে যে কেবলমাত্র শাস্তির উপর জোর দিও না বরং সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি দাও। যদি মনে করো যে ক্ষমা করলে সংশোধন হবে তবে ক্ষমা করো আর যদি অবস্থা এবং ঘটনাপ্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে শাস্তি দেওয়ায় সংশোধনের সম্ভাবনা থাকে তবে শাস্তি দাও কিন্তু শাস্তিদানে এ কথাটি বিশেষ করে স্মরণ রাখতে হবে যে, শাস্তি ও অপরাধের অনুপাত বজায় রেখে চলতে হবে নতুবা যদি শাস্তি অপেক্ষা অপরাধ তুলনামূলক অধিক হয়ে যায় তবে তা অত্যাচার ও সীমালঙ্ঘন বা বাড়াবাড়ি হবে এবং অত্যাচার ও বাড়াবাড়িকে খোদাতাআলা পছন্দ করেন না।

সুতরাং ইসলামে পূর্ববর্তী ধর্মের মত বাড়তি বা ঘাটতি নেই। এর উন্নতমানের দৃষ্টান্ত আমাদের আঁ হযরত (সাঃ)এর জীবনধারণে দৃষ্টিগোচর হয় যখন তিনি (সাঃ) দেখেন যে, অপরাধীর সংশোধন হয়ে গেছে, তো তাঁর ঘোর অত্যাচারী শত্রুকেও তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাঁর উপর, তাঁর সন্তানদের উপর, তাঁর সহচারীদের উপর কত প্রকারের অত্যাচারই না হয়েছে কিন্তু যখন শত্রু ক্ষমা যাচঞা করলো এবং খোদা ও তার রসূলের আদেশানুযায়ী জীবন পরিচালনার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো তো তিনি (সাঃ) সবকিছু বিস্মৃত হয়ে ক্ষমা প্রদর্শন করলেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে,- আঁ হযরত (সাঃ) এর কন্যা হযরত জয়নাবের উপর মক্কা হতে হিজরতকালে এক অত্যাচারী শত্রু হাবার বিন আসুদ বর্শা দ্বারা

প্রাণহানি আক্রমণ করে। তিনি সে সময় অন্তঃসত্তা ছিলেন এবং সেই আক্রমণের ফলে তিনি আহতও হন, এবং পরে তাঁর গর্ভপাতও ঘটে, অবশেষে সেটি তাঁর প্রাণনাশের কারণ হয়। সেই অপরাধের দরুণ সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে হত্যার সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় কিন্তু তাঁর (সাঃ)এর ক্ষমাশীলতা এতই ব্যাপক ছিল যে, যখন সেই ব্যক্তি নিজের অবমাননাকর আচরণ ও অত্যাচার-পাপসমূহ স্বীকার করতে গিয়ে ক্ষমার যাচঞা করলো বা ক্ষমাভিক্ষা করলো তখন আঁ হযরত (সাঃ) নিজ কন্যার সেই হত্যাকারীকে ক্ষমাদান করলেন এবং বললেন যে, যাও হাবার! আল্লাহর তোর উপর করুণা এই যে তিনি তোকে ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য দান করেছেন এবং সত্য তওবা বা অনুতপ্ত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন।

এরূপে আরেকটি বর্ণনায় আছে যে,- এক কবি ক্যয়ব বিন জহির ছিল যে মুসলমান মহিলা সম্পর্কে বড়ই নোংরা ও অশ্লিল কবিতা লিখত ও অশ্লিল পংক্তি বলে বেড়াত তাদের চরিত্রের উপর আক্রমণ করে বেড়াত, তারও বিরুদ্ধে শাস্তির আদেশ হয়। যখন মক্কা জয় হোল তখন ক্যয়বের ভাই তাকে লিখলো যে মক্কা বিজয় হয়ে গেছে। তোমার জন্য এটিই কল্যাণকর হবে যে তুমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)এর নিকট ক্ষমা পার্থনা করো, যাইহোক যখন সে অনুতপ্ত হয়ে মদীনায় এলো এবং ক্ষমাপ্রার্থী হলো তখন আঁ হযরত (সাঃ) অদ্ভুত ভালবাসা প্রদর্শন করে তাকেও ক্ষমা দান করলেন। সেই ব্যক্তি আবার একটি প্রশংসাগীতিও আঁ হযরত (সাঃ) এর সম্মুখে উপস্থাপন করলো। আঁ হযরত (সাঃ) একটি চাদর তাকে উপহার স্বরূপ দান করলেন।

তাই যে শত্রুর বিরুদ্ধে শাস্তির আদেশ জারি হয়ে গিয়েছিল তিনি (সাঃ) এর আদালত হতে সে কেবল প্রাণ ফিরেই পেল না বরং উপহারও লাভ করে ফিরে গেল। তাই এরূপ বহু ঘটনা আছে যা আঁ হযরত (সাঃ) এর জীবনে আমরা দেখতে পাই যে তিনি সংশোধনের পর নিজ ব্যক্তিগত শত্রুদেরও ক্ষমাদান করলেন, নিজ নিকটাত্মীয়দের শত্রুদেরও ক্ষমা দান করলেন এবং ইসলামের শত্রুদেরও মার্জনা করলেন কিন্তু যেখানে সংশোধনের জন্য শাস্তির প্রয়োজন ছিল বা যদি শাস্তির প্রয়োজন পড়তো তো শাস্তিও দিয়েছেন তিনি। তাই প্রকৃত উদ্দেশ্য এই আদেশের গুরুত্বকে দৃষ্টিপটে রেখে করা যে, তুমি সংশোধন করতে চাও না প্রতিশোধ নিতে চাও। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) সূরা আসূরার এই ৪১ নং আয়াতের নিজ বিভিন্ন রচনাবলী ও পুস্তকাবলীতে বহু স্থানে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর (আঃ)এর অন্তত ১৩টি পুস্তকে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে হয়ত এর চেয়েও অধিক হতে পারে এবং সেগুলিতে ২১- ২২টি বিভিন্ন স্থানে এই বিষয়ে তিনি বর্ণনা প্রদান করেছেন। এরূপে নিজ সভায়ও বহুবার এর উল্লেখ করেছেন। 'ইসলামী নীতিদর্শন' এ তিনি (আঃ) শাস্তি ও ক্ষমার ব্যাখ্যা ও মর্ম বোঝাতে গিয়ে বলেন যে, শাস্তি অন্যায়ের অনুপাতে হওয়া উচিৎ (এই আয়াতের আলোকে) কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যায় ক্ষমা করে দেয় এবং এইরূপ পরিস্থিতিতে ক্ষমা করে যে তা হতে তার সংশোধন সাধিত হয় কোনপ্রকার কুফল সৃষ্টি না হয়ে অর্থাৎ বিশেষ ক্ষমার ভিত্তিতে ও যথাযথ স্থানে করে, অস্থানে নয়। তাহলে এমন ব্যক্তি এর প্রতিদান পাবে (অর্থাৎ ক্ষমাকারী ব্যক্তি আল্লাহতাআলার নিকট হতে তার ফল পাবে)। তিনি বলেন যে,- এই আয়াত হতে স্পষ্ট ফুটে ওঠে যে, কোরআনী শিক্ষা এ নয় যে, নির্বিচারে সর্বত্র অন্যায়ের মোকাবিলা করবে না এবং দুষ্কৃতকারী ও অত্যাচারীকে শাস্তি দেওয়া হবে না (কোনও কোনও ক্ষেত্রে অন্যায়ের মোকাবিলা করতে হয়) বরং এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, এটি দেখা উচিৎ যে সে অবস্থা ও ঘটনাপ্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে শাস্তি দেওয়ার না ক্ষমা দানের। সুতরাং অপরাধীর পক্ষে এবং জনসাধারণের পক্ষে যা কিছু সত্যিকার অর্থে কল্যাণকর সেই পন্থাই অবলম্বন করা উচিৎ। আজকাল যারা নিজেদেরকে মানবাধিকারের অগ্রদূত মনে করে বেড়ায় তারা একদিকে সীমালঙ্ঘন করেছে। কারুর যতই বৃহৎ দোষ হোক না কেন ব্যক্তিগত সমবেদনার নামে অপরাধীদের এত বিরাট শাস্তি দেওয়া হয় যে বহু অপরাধীর মধ্যে তাদের কৃত অত্যাচারের অনুভূতিও ম্লান হয়ে গেছে বা চেতনাই হারিয়ে ফেলেছে। হত্যা আছে, পেশাদার খুনী আছে বা অহংকারবোধ এতই বেড়ে গেছে যে তাদের নিজেদের ছাড়া অপর কারুর জীবনের কোন মূল্য বা গুরুত্বই চোখে পড়ে না। এমন ব্যক্তিদের শাস্তি তো মৃত্যুদন্ডই হওয়া উচিৎ কেবল সেই ব্যক্তি ছাড়া যাকে নিহত ব্যক্তির হত্যাকারী ক্ষমা করে দেয়।

আবার হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন যে,- শুধু এটি দেখলেই চলবে না এও লক্ষ্য রেখো যে অপরাধীর জন্য কোনটি কল্যাণকর। কখনও কখনও এটি দেখতে হয় যে, কেবল অপরাধীর প্রতি যত্নবান না হয়ে বরং সাধারণ সমাজের জন্য কোনটি কল্যাণজনক। কখনও বা সমাজের কল্যাণার্থে তুচ্ছ বিষয়কে বৃহৎ বিষয়ের নিমিত্তে ত্যাগ করতে হয়। এজন্য যে কোন শাস্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় এটি দৃষ্টিপটে রাখা প্রয়োজনীয় যে সমাজের উপর সমষ্টিগতভাবে কিরূপ প্রভাব পড়ছে। কখনও কখনও ক্ষমা প্রদর্শন সমাজের জন্য বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যে দেখো! এত বড় অপরাধী আর সে পাপ করেও বেঁচে গেল। তাই দুষ্ট প্রকৃতির মানুষেরা এ ধারণা করে থাকে যে, আমরাও অনাচার করে ক্ষমা চেয়ে বেঁচে যাব। এইরূপ পরিস্থিতি আবার অপরাধীদের তাদের মন্দ আচরণ করার জন্য সাহসের যোগান দেয় এবং শক্তিশালী করে তোলে। যদি ক্ষমাপ্রদান অপরাধীদের সাহসী বা ধৃষ্ট কোরে তোলে তবে সেখানে শাস্তির প্রয়োজন আছে, ক্ষমার নয়।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এক সময় ইসলামের আকর্ষণীয় শিক্ষার বিষয়ে তৌরাত এবং ইঞ্জিলের সহিত তুলনা করতে গিয়ে বলেন যে,- ইঞ্জিলে লেখা আছে যে তোমরা অন্যায়ের মোকাবেলা কোর না, এক কথায় ইঞ্জিলের শিক্ষা শিথিলতাপ্রবণ এবং বিশেষ পরিস্থিতির পরিবেশ ব্যতীত মানুষ এর উপর প্রতিষ্ঠিত হতেই পারে না। পক্ষান্তরে তৌরাতের শিক্ষাকে দেখা গেলে সেখানে বাড়াবাড়ির প্রবণতা অধিক এবং তাতেও কেবল একটি দিকের প্রতি অধিক মনোনিবেশ করা হয়েছে যে প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, কানের বিনিময়ে কান এবং দাঁতের বিনিময়ে দাঁত ভেঙ্গে দেওয়া হোক। এতে নম্রতা ও উপেক্ষার নামও পর্যন্ত নেওয়া হয়নি কিন্তু কোরআন শরীফ আমাদের কতই পুণ্য পথের দিশা দিয়েছে এবং সকল প্রকার শিথিলতা ও বাড়াবাড়ি হতে পবিত্র এবং একান্ত মানবপ্রকৃতিসম্মত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ কোরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে,- وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ অর্থাৎ যতটা অপকর্ম করা হয়েছে তুলনামূলক ততটাই শাস্তি দেওয়া বৈধ অর্থাৎ ততটাই শাস্তিপ্রদান করা ন্যায়সঙ্গত কিন্তু যদি কেউ ক্ষমা করে দেয় এবং সেই ক্ষমার পশ্চাতে সংশোধন উদ্দেশ্য হয়ে থাকে অপ্রাসঙ্গিক বা যথাস্থানে মার্জনা করা না হয়ে থাকে বরং যথাস্থানে মার্জনা প্রদর্শিত হয়ে থাকলে এরূপ ক্ষমা প্রদর্শনের জন্য যে সুফল তা তাকে খোদার নিকট হতে প্রাপ্তি হয়।

সুতরাং ইসলামী শিক্ষাই এমন শিক্ষা যা প্রত্যেকটি যুগে পৃথিবীর সকল সমস্যাবলীর সমাধান করে, সেটি শাস্তির জন্য হোক বা অন্যান্য কোন বিষয় হোক। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন যে,- এক ধরনের মানুষ আছে যারা ক্ষমা করা তো জানেই না এবং পিতা পিতামহের যুগ হতে পর্যায়ক্রমে শত্রুতা স্মরণ করে রাখে এবং অপরদিকে এমন ধরনের অভদ্র ও আত্মাভিমহীণ নির্লজ্জ ব্যক্তিরাও আছে যারা পুণ্য পথের জন্য দাগস্বরূপ আর ক্ষমার নামে ধৃষ্টতা দেখায়। তাই ধৃষ্টতাও থাকা উচিৎ নয় এবং অন্যায়ও যেন না হয় যদি কেউ কারুর কন্যা-বোনের সম্মানের উপর আক্রমণ করে আত্মমর্যাদার উপর হামলা করে তবে আইনের সীমায় থেকে ক্রীয়াকলাপ হওয়া চাই সেখানে ক্ষমার প্রশ্ন ওঠে না। সুতরাং ক্ষমা এবং ধৃষ্টতার মধ্যে পাথ্যর্ক জানার চেষ্টা করা উচিৎ কিন্তু আইনকে হাতে না নেওয়া আবশ্যকীয় শর্ত হবে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)বিভিন্ন স্থানে এর প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তাঁর বর্ণনা হতে কিছু আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এই ব্যাখ্যাগুলি একই প্রকার বিষয় সামনে উপস্থাপিত হচ্ছে বলে মনে হবে কিন্তু সর্বত্র তিনি এর প্রেক্ষাপটে যে বর্ণনা প্রদান করেছেন তাতে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে বিভিন্ন উপদেশাবলী এতে নিহিত রয়েছে। এক স্থানে তিনি বলেন যে,- অপকর্মের বিনিময়ে অন্যায়ের অনুপাতেই সেই পরিমাণই শাস্তি হওয়া উচিৎ কিন্তু যে ব্যক্তি নম্রতা অবলম্বন করে ও পাপকে ক্ষমা করে দেয় এবং সেই নম্রতার ফলস্বরূপ কোন অমঙ্গল সাধিত না হয়ে সংশোধন সাধিত হয় তবে খোদা তার উপর তুষ্ট হবেন এবং তাকে তার পরিণামে কৃপা দান করবেন। অতএব কোরআন অনুযায়ী না প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিশোধ বলবৎ হয় বা (না প্রতিশোধ নেওয়া প্রশংসার যোগ্য) এবং না প্রত্যেক ক্ষেত্রে নম্রতা প্রদর্শন প্রশংসার যোগ্য গণ্য হয় বরং পরিস্থিতির সনাক্তিকরণ করা উচিৎ এবং উচিৎ যে প্রতিশোধ ও নম্রতার আচরণ নিষেধাজ্ঞা অবস্থা ও পরিস্থিতির সাপেক্ষে হওয়া উচিৎ লাগামহীণভাবে নয়। এটিই কোরআনের শিক্ষার উদ্দেশ্য।

তিনি বলেন,- খোদা সেই ব্যক্তির উপর প্রসন্ন হন যার অভিপ্রায় পবিত্র হয় এবং তার কর্ম ও ক্রিয়ার উদ্দেশ্য সংশোধন হয়। নির্লজ্জ বা আত্মাভিমানহীণ ব্যক্তিকে ক্ষমা করলে খোদা প্রসন্ন হন না আর না তার উপর প্রসন্ন হন যে প্রতিশোধের মনোভাব পোষণ করে। এই দুটি বিষয় সামনে রাখা দরকার। এতটাও নম্র হওয়া উচিৎ নয় যে সম্পূর্ণরূপে নির্লজ্জ হয়ে যাও, এমনটি করলেও আল্লাহতাআলা প্রসন্ন হন না এবং শুধু প্রতিশোধের মন-মানসিকতাও রেখো না। সুতরাং উভয় সীমা সম্মুখে রেখে ক্ষমা ও শাস্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ। এ বিষয়ে জামাতী পদাধিকারীদের এবং ব্যবস্থাপনাকেও এ কথার দিকে মনোযোগ রাখা উচিৎ সাধারণত সতর্কতা অবলম্বন করা হয়ে থাকে, কতিপয় লোকের বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বা আমার নিকট সুপারিশ এসে থাকে আমি এটি তো বলবো না যে এসব কিছু প্রতিশোধের জন্য হয়ে থাকে কিন্তু এটি অবশ্যই কোন কোন সময় হয়ে থাকে যে, সুপারিশকারীর বিশেষ প্রবণতা কঠোরতার প্রতিই হয়ে থাকে এবং কিছু তাদের মধ্যে অতি নম্রতা ও ক্ষমার প্রতি প্রবণতা রাখেন যার ফলে ক্ষতিকারক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। অতএব না শাস্তিদান পছন্দনীয় জিনিস আর না ক্ষমা করা প্রশংসার বিষয়। প্রকৃত বস্তু হোল আল্লাহতআলার সন্তুষ্টি অর্জনের পথ অনুসরণ করা এবং তা সেই সময় অর্জন করা সম্ভব যখন সংশোধন বা শুদ্ধিকরণ উদ্দেশ্য হয় এবং তার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগসমুহের উচিৎ যে তারা চেষ্টাবনত হন সে আমুর-এ-আমা হোক বা কাজা বা বিচার বিভাগ হোক তারা যেন অধিক গভীরতায় প্রবেশ করে সুপারিশ বা সিদ্ধান্ত নেন যাতে তা প্রকৃত ব্যবস্থাপনা ও অবস্থা আমরা নিজেদের মাঝে ও জামাতের মাঝে সৃষ্টি করতে পারি যা খোদাতাআলার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হয় এবং তার জন্য খোদাতাআলার নিকট দোয়া ও সাহায্য চাওয়াও প্রয়োজনীয়। যখনই কোন ফয়সলা বা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় দোয়ার সহিত তা নেওয়া উচিৎ এবং তারপর যুগখলীফার নিকট সুপারিশের জন্য প্রেরণ করা উচিৎ যাতে প্রত্যেক ধরনের কুপ্রভাব হতে সেই ব্যক্তিও নিরাপদ থাকে যার বিরুদ্ধে

অভিযোগ তোলা হচ্ছে এবং জামাতের ব্যবস্থাপনাও সুরক্ষিত থাকে এবং জামাতের কোনও ধরনের সিদ্ধান্ত অতৃপ্তিকর পরিস্থিতির কারণ না হয়। এইরূপেই আরেকটি স্থানে স্বীয় পুস্তক 'নসিম দাওয়াত' এ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এই বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন যে ইসলামের আপত্তিকারী যারা আছেন এবং অমুসলমানদের ইসলামের সুন্দর শিক্ষার জ্ঞান থাকা চাই তিনি (আঃ) এটি বড়ই স্পষ্টভাবে বর্ননা করেছেন যে, এটি এতই সুন্দর যা অন্য কোন ধর্মে নেই। তিনি বলেন যে,- যদি তোমাকে কেউ দুঃখ দেয় দৃষ্টান্তস্বরূপ দাঁত ভেঙ্গে দেয় বা চোখ অন্ধ করে দেয় তবে তার শাস্তি সেই প্রকৃতির আঘাতই হবে যা সে করেছে কিন্তু যদি তুমি এরূপ পরিস্থিতিতে তার অপরাধকে ক্ষমা করে দাও যে সেই ক্ষমার কোন মঙ্গলময় পরিণাম সৃষ্টি হওয়া সম্ভব এবং তার ফলে কোন সংশোধনের সম্ভাবনা থাকে, অর্থাৎ দৃষ্টান্তস্বরূপ অপরাধী পরবর্তীতে এই কু-অভ্যাস হতে বিরত হয়ে যাবে (সংশোধন স্বরূপ অপরাধী এরূপ কু-কর্ম হতে বিরত হয়ে যাবে) তো এই পরিস্থিতিতে ক্ষমা করাই শ্রেয় হবে এবং সেই ক্ষমার প্রতিদানে খোদার পক্ষ হতে সেই ব্যক্তি সু-প্রতিদান পাবে।

যেভাবে বিধির আইন এই যে, আমাদের খাদ্যবস্তু পরিবর্তিত হতে থাকে এবং খাদ্যসামগ্রীও সময়ের দাবী অনুযায়ী আল্লাহতাআলা সৃষ্টি করেছেন। অনুরূপভাবে গ্রীষ্ম, শীতের মরশুমে পোশাক আসাক পরিবর্তিত হয়ে থাকে এই সমস্ত বিষয় বিধানের নিয়ম অনুযায়ী হয়ে থাকে, তিনি বলেন যে,- ঠিক এইভাবে আমাদের নৈতিক ও প্রকৃতিগত অবস্থাও সময় অনুযায়ী পরিবর্তন চায়। এক সময় চোখ দেখানো বা দাপোট দেখানোর প্রবণতা আসে সে সময় নম্রতা ও উপেক্ষা বা বিনয়ের দ্বারা আরও কাজ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং অপরদিকে কোন সময়ে নম্রতা ও তোষামোদের উপক্রম হলে সেখানে কঠোরতা বা দাপট দেখালে অশোভনীয় পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ প্রতিটি সময় এবং প্রতিটি পরিস্থিতি একটি বিষয়কে আশা করে। সুতরাং যে ব্যক্তি সময় কাল ভেদে তা করে না সে অমানুষ, মানুষ নয়।

আবার এক স্থানে তিনি বলেন যে, কোরআন শরীফ অহেতুক নম্রতা ও উপেক্ষাকে বৈধ আখ্যায়িত করেনি। কারণ তা হতে মানুষের চরিত্র নষ্ট হয় এবং পৃথক ব্যবস্থাপনার শৃঙ্খলা হারিয়ে যায় বরং সেই নম্রতার অনুমতি দেওয়া হয়েছে যা হতে কোনরূপ সংশোধন হতে পারে।

যদি প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেদের দৈনন্দিন সমস্যার এবং পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজেদের আত্মজিজ্ঞাসা করে যে, সে অপরের জন্য কিরূপ মনোভাব পোষণ করে এবং নিজ সম্পর্কে কি ধারণা করে তবে এতে সমাজে এক প্রকার সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হয়।

অতএব প্রকৃত বিষয় এটিই যে সর্বদা এটি দৃষ্টিপটে রাখে যে প্রত্যেক কর্ম আল্লাহতাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হতে হবে। যখনই এটি হবে তবেই সংশোধন হবে।

সুতরাং এই দুটি বিষয়কে আমাদের সর্বদা সম্মুখে রাখা উচিৎ এবং এজন্য সম্মুখে রাখা উচিৎ যে আমাদেরকে সংশোধন করতে হবে এবং অনিষ্ট বা অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করতে হবে। সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ তৈরী করতে হবে এবং সবচেয়ে বড় জিনিস হোল খোদাতাআলাকে সন্তুষ্ট করতে হবে কারণ তিনি অত্যাচারীকে পছন্দ করেন না। আল্লাহতাআলা আমাদের কোরআনের আদেশাবলীকে অনুধাবন করার এবং তার উপর প্রতিষ্ঠিত হতে সৌভাগ্য দান করুন।

খুতবা জুমআর শেষে হুযূর আনোয়ার (আইঃ) মোকাররম বেলাল মাহমুদ সাহেবের পুণ্য কাজের ও সেবার উল্লেখ করেন যাঁকে ১১ই জানুয়ারী রাবোয়ায় শহীদ করা হয়েছিল। তাঁর গায়েব জানাজা নামাজের ঘোষণা দেন।

অনুবাদকঃ বুশরা হামীদ, নাজারাত নাশরো ইশাআতের নির্দেশক্রমে

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar 22th January, 2016

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To.....

.....

.....

NAZARAT NASHR-O-ISHAAT, QADIAN, INDIA